ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 641-648
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.053

অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে প্রান্তজনের জীবনচর্যা

সীমা সূত্রধর, *স্বাধীন গবেষক, দত্তপুকুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.11.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

While exploring the literature of Anil Gharai, one can clearly notice the author's selective love for the rural towns. The author's preference for the region instead of the township of the center is evident in the naming of several of his stories. The strange lifestyle of the rural towns, the way of life, the ups and downs of their life have been repeatedly represented in his stories and novels. Raised in the warm embrace of rural civilization, Anil Gharai's short stories have become clear in the reformation-culture of the village society, the unique experiential heartbeat of the life and livelihood of the marginal people. 'Pokaparban', 'Bogulahoot', 'Baligarh', 'Jalkumari', 'Chatak', 'Gobrahanu'- short stories have been tried to highlight this heart beat of the life of the marginal people.

Keyword: Livelihood, Poverty, Existence, Scarcity, Social structure.

অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্য পরিভ্রমণ করতে গিয়ে স্পষ্টত লক্ষ করা যায় প্রান্তভূমির জনপদের প্রতি লেখকের নির্বাচন প্রিয়তা। কেন্দ্রভূমির জনপদের পরিবর্তে প্রান্তভূমির প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব ধরা পড়েছে তাঁর একাধিক গল্পের নামকরণেই। গ্রামীণ জনপদের বিচিত্র জীবনাচরণ, জীবনভাবনা, তাদের জীবনপ্রবাহের উত্থান-পতন বারংবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। গ্রামীণ সভ্যতার নিভৃত আলিঙ্গনে লালিত অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গ্রামসমাজের সংস্কার-সংস্কৃতি, প্রান্তজনের জীবন-জীবিকার বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় হৃদস্পন্দন। অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে দেখা যায়, প্রান্তজনের সাধারণ জীবনের একটি স্পষ্ট রূপরেখা দিতে গিয়ে লেখক গ্রাম সভ্যতার অন্ধকার কোণ থেকে এমন এমন চরিত্র উন্মোচন করেছেন- যাদের ব্যক্তিনাম, নিতান্ত তুচ্ছ জীবন পাঠককে কৌতূহলী করে। তিনি এমন সব জীবিকার সন্ধান দিয়েছেন যা উন্নত সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ প্রান্তজনের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেই জীবিকাই তাদেরকে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল দান করেছে, তাদের নিজস্ব আইডেন্টিটির আয়ুধ হিসেবে কাজ করেছে। বিষয়টিতে আলোকপাত করার জন্যে কয়েকটি গল্প অবলম্বন করা হল।

'পোকাপার্বণ' গল্পে কৃষিনির্ভর সমাজগোষ্ঠীর পরিচয়ের পাশাপাশি ধরা পড়েছে গ্রামসমাজের একটি ভিন্ন ঐতিহ্যময় জীবিকা- খোলের কারবার। গ্রামের হলা বুড়োর পৈতৃক ব্যবসা এটি। হলা বুড়ো সম্পর্কে লেখকের অভিব্যক্তি,

> "হাঁড়িপাড়ায় গোটা বারো চালাঘর, একেবারে টেরের ঘরটা হল হলা বুড়োর খোলঘর। খোলঘরে খোল সারে হলা, তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে- দেখলে মনে হয় ধুঁকো মানুষটা ঘাটের মড়া"।[১]

বংশগত জীবিকা সংরক্ষণে হলা বুড়োর ঐকান্তিক লড়াই, দীর্ঘশ্বাসের অনুরণন লক্ষ করার মতো। হলা বুড়োর সংসারে পচা ভাদোদের ধারার মতো ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে অভাব, দারিদ্র্য। তবু হলা বুড়োর জাতব্যবসাপ্রীতি-প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পঞ্চাশোর্ধ দুর্দান্ত বয়স নিয়েও খোল সারানোর ধৈর্যে হলা বুড়ো অটুট। কেঁচোমাটি সংগ্রহ করা, মাটি পুড়িয়ে গুঁড়ো করে খোলের 'গাব' তৈরি করা, পুরনো গাব ঝেড়ে নতুন গাব করে রোদ খাইয়ে 'লয়' বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি। নানাপ্রকার অভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটির পরিচয়ে গল্পটি ধারণ করে আছে গ্রামসংস্কৃতির লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য। দারিদ্র্যময় জীবনে অভাবের সঙ্গে লড়াই করেও ব্যবসার কাজে অকৃত্রিম আনন্দলাভ, গৌরবান্বিত হওয়া এক স্রষ্টার অনুভূতি প্রদান করেছে হলা বুড়োকে। এ ধরনের জীবন-জীবিকায় হাঁড়িপাড়ার হলা বুড়োর ভাবপ্রকাশ,

> "খোল ব্যবসায় আর কিছু না হোক- হাতের কাজ ভাল করলে গ্রামসমাজে খাতির বাড়ে, বাপ-পিতামহের নাম নিজের নামের পাশে পাশে ঘোরে- যা কানে এলে এই বয়সেও মন্দ লাগে না হলা বুড়োর"।[২]

সমাজব্যবস্থা নামক পরিকাঠামোটি তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন স্তর নিয়ে। প্রতিটি স্তরে গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা, নির্দিষ্ট প্রণালী। বৃহত্তর অর্থে রাষ্ট্রব্যবস্থা এই সমাজ পরিকাঠামোটির উপর সার্বিক শৃঙ্খলা চাপিয়ে দিলেও আংশিক দৃষ্টিতে প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় থাকে ভিন্ন আচরণ। সেই বিচিত্র সমাজব্যবস্থার, বিশেষত প্রান্তিক স্তরের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে অনিল ঘড়াইয়ের সাহিত্যে। প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক বিচিত্র জীবিকার সন্ধান দিয়েছেন, জীবিকানির্ভর বিচিত্র জীবনযুদ্ধের পরিচয় দিয়েছেন। 'বালিগড়' গল্পে পৌঁছে সমুদ্র তীরবর্তী প্রান্তিক মানুষের এক নিষিদ্ধ জীবিকা পালনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। বালিগড় নামক আঞ্চলিক শব্দেই অনুমান করা যায় জীবিকাটির স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। কচ্ছপ ধরা বা খাওয়ার ব্যাপারে যেখানে কড়াকড়িভাবে সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ, সেখানে দিঘার সমুদ্রতটে গোপনে রমরমিয়ে চলছে এ ব্যবসা। শীতের রাতে সাইকেল চেপে বহুদূর পেরিয়ে ব্যাঙার মতো মানুষকে এ প্রতিযোগিতায় সামিল হতে হয়, জেলে নৌকাগুলো তীর ছোঁয়ার আগেই হুড়োহুড়ি করে দখল নিতে হয় মালের। তারপর পুলিশ- প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে, কখনও জরিমানা, কখনও বা প্রহারের বিনিময়ে কারবার করতে হয় বালিগড়ের। বালিগড়ের মতো অপ্রতুল প্রাণী চোরাচালানে জীবনের ঝুঁকি থাকে বিস্তর। পুলিশি নির্যাতনের ভয়-আতঙ্ক নিয়ে, শীতের রাতের গভীর কষ্ট স্বীকার করে অস্তিত্বের লড়াই করতে হয়েছে ব্যাঙাকে।

> "পৌষ মাসের শীতও তার কাছে কাবু। জলো হাওয়া-বাতাস সব তার কাছে একটিপ নস্যি। গায়ে একটা ফিনফিনে জামা। জামার নীচে সঁপড়ির বুনে দেওয়া জালি গেঞ্জি। খুব বেশি হলে কানটা ঢাকার জন্য একটা মাফলার। সেটাও সঁপড়ির বোনা"।[৩]

প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ এরকম নানা অপ্রচলিত জীবিকাকে আঁকড়ে ধরেছে জীবনযাপন প্রতিপালনে। বালিগড়ের মতো অমূল্য প্রাণী চালান করে ব্যাঙারা সম্পদশালী হতে পারে না, দৈনন্দিন স্বচ্ছলতা লাভ করে মাত্র। বালিগড় সম্পর্কে ব্যাঙার অভিমত,

> "খাসি তিরিশের কম নয়, শুয়োর আঠারো থেকে কুড়ি। সস্তা বলতে বালিগড়। লোকে খাচ্ছে ভালো"।[৪]

ঝুঁকি নিয়ে নামা এ কাজের বিনিময়ে রক্ষিত হয় মাত্র প্রান্তজনের দৈনন্দিন জীবনবৃত্ত। গল্পের শুরুতেই লক্ষ্য করা যায় ব্যাঙার বিপদগ্রস্ত পরিস্থিতি। চোরাপথে বালিগড় আনতে গিয়ে তার কোণঠাসা পরিণতি,

> "সাইকেলের পেছনের কেরিয়ারে চটের ছালায় মোড়া আছে বালিগড়, দূর থেকে দেখে মনে হয় কাঁচা আনাজের ঝুড়ি। কিন্তু পুলিশটার নজর এড়াল না। হিড়হিড়িয়ে হাত ধরে টেনে আনল ব্যাঙাকে। কষে পিছনে ঘাকতক রুলের বাড়ি। বাপরে, মারে চিল্লিয়ে উঠল শীতকনকনে ব্যাঙা, ছাড়ি ওগো বাবু, তুমার দুটা গোড়তোল পড়ি গরীব মানুষ মুই। এই করিকি খাইটি। ভাতে মারবনি গো, তুমার মা-বাপের দিব্যি"।[৫]

জীবনকে বাজি রেখে এভাবে প্রতিনিয়ত প্রতিপালিত হয় অসংখ্য প্রান্তিক মানুষের জীবন। এ ধরনের অপ্রচলিত জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রেও আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় তাদের অসাধারণ জীবনীশক্তি, অদম্য সাহস, মানসিক প্রশান্তি। বালিগড় ধরা থেকে শুরু করে কাটার মতো অস্বস্তিকর ক্ষেত্রেও ব্যাঙা একইভাবে সিদ্ধহস্ত। গা-হাত-পা মাখা জ্যাবজ্যাবে রক্ত নিয়েও ব্যাঙা আত্মতুষ্টি লাভ করেছে কর্ম স্বাধীনতায়। ব্যাঙার অনুভূতিতে ধরা পড়েছে,

> "ইস্পাতের ধারালো ফলায় টুকরো টুকরো বালিগড়। চিকচিক কাগজে রক্তের থোক থোক ফুল। মাংসগুলো হাওয়া লাগা পলাশ ফুলের মতো নড়ছে"।[৬]

সাদা গেঞ্জিতে লেগে থাকা রক্তের ছিটে, মুখের চারপাশে ছিটকে আসা রক্তের জমাটি, মাছির ভনভনানি- ইত্যাদির সঙ্গে সহজেই মানিয়ে নিয়েছে ব্যাঙা।

জীবন-জীবিকার এক বিচিত্র পরিচয় নিয়ে উত্থাপিত হয়েছে 'জলকুমারী' গল্পটি। জীবনধারণের জন্য প্রান্তিক মানুষ কত যে করুণ পরিস্থিতির শিকার হতে পারে, অতি সাধারণ কাজের জন্যও চরম আশাবাদী হয়ে ওঠে; 'জলকুমারী' তার অন্যতম নজির। চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত পরিবারে যেখানে একের বেশি পোশাকের স্বচ্ছলতা নিতান্ত অকল্পনীয়, শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ যেখানে মেলে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনওরকমে দিনপাত হয়, সেখানে জলদানের মতো সামান্য কাজও স্বপ্ন সঞ্চার করেছে সরলার কাছে।

> "জীবিকা নির্বাহের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র আর্থিক অভাব দূরীভূত হয় না, অনেক স্বপ্নপূরণও হয়, জীবনে সম্মান ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। জীবিকাহীনতা মানবজীবনে বেকারত্বের অভিশাপ ও জীবন সংকটকে ডেকে আনে। ধনী থেকে নির্ধন প্রত্যেকে জীবিকা নির্বাহ করে জীবনকে পরিচালিত করে। কিন্তু জীবন ও জীবিকার দ্বন্দ্ব, জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রাম দরিদ্র মানুষদেরই জীবনে লক্ষ্য করা যায়"।[৭]

মাইতিবাবুর সুপারিশে পাওয়া রেলবাবুদের জল দেওয়ার কাজটি মহামূল্য লাভ করেছে সরলার অভাবী সংসারে। মাসের সামান্যতম পারিশ্রমিক দিয়েই অভাবী সংসারের দৈন্য মোচনের স্বপ্ন দেখেছে সরলা।

মায়ের পুরোনো, নোংরা, ফেঁসে যাওয়া শাড়ির পরিবর্তে একটা নতুন কালোপেড়ে শাড়ি ও ভাইয়ের জন্য ন্যূনতম দামের রোদচশমা কেনার আনন্দঘন শিহরণে বিভোর হয়ে থাকে সে। সামান্য উপার্জনেই পৃথিবী জয়ের আত্মশক্তি লাভ করে। চূড়ান্ত অভাবী জীবনযাপনে যে অসহায়তা, মানসিক শূন্যতা প্রতি মুহূর্তে তৈরি হয় প্রান্তিক জীবনে; জীবিকার অভাব সেখানে অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। মাকে কেন্দ্র করে সরলার অভিব্যক্তি,

> "মাঝে মাঝে তার যে কি হয় সে নিজেও জানে না। মায়ের দুঃখ-দুর্দশার কথা তার বেশি করে মনে পড়ে। জ্ঞান বাড়ার পর থেকে মাকে সে হাসতে দেখেছে কম দিন"।[৮]

সরলা বা আশালতার এই দুঃখী মনের ভরকেন্দ্র জীবিকার নির্ভরতায় পরিবর্তিত হয় সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায়। সরলা তার কাজের আয়ু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। বর্ষা এলেই মেয়াদ ফুরোবে তার কাজের। এই স্বল্পমেয়াদি কাজেই সবসময় সতর্ক থাকতে হয় তাকে কাজের নৈপুণ্য নিয়ে, সবসময় অনুগত থাকতে হয়েছে, বকুনি-শাসন শুনতে হয়েছে। তবুও এই গৌণ কাজের সহায়তায় স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে সরলা, আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। প্রান্তিক জনসমাজের মধ্যে বিচরণ করে অনিল ঘড়াই এরকম অসংখ্য গৌণ জীবিকার সন্ধান, জীবিকাকে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক দোলাচলতা, স্বপ্নময় জীবনগঠনের পরিচয় উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে।

অনিল ঘড়াই শহর থেকে নগর, নগর থেকে আস্তাকুঁড় কিংবা গ্রামের অভ্যন্তরে সর্বত্রই ব্রাত্য, অবহেলিত, পিছিয়ে থাকা জনজাতির জীবনযাত্রার স্থূল আবরণ সরিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নগ্নরূপ তুলেছেন তাঁর সাহিত্যে। প্রান্তবর্তী মানুষগুলোর বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমস্তটাই দায়বদ্ধতার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ করেছেন তিনি। 'বগলাহুট' গল্পটি অনুরূপভাবে আস্তাকুঁড়ে জীবনের চলমানতাকে বহন করেছে সাবলীলভাবে। গল্পটির নামকরণই দাবি করে গরিব-গুরবোকে প্রদেয় কুখাদ্যের শিরোনাম- 'বুলগার হুইট'। এ গল্পটিতে দেখা গেল, একমাত্র খাদ্যের দাবিতে পরিচালিত হয়েছে জীবন-যৌবন, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা। খাদ্যের বাইরে অন্যমাত্রিক আবেদন সাড়া ফেলতে পারেনি আস্তাকুঁড়নির্ভর ভিখিরি জীবনে। দারিদ্র্যের মাত্রা কতখানি তীব্র হতে পারে, তাদের জীবনযাত্রার ধরনই বা কীরকম- তার নমুনা হয়ে আছে 'বগুলাহুট'। দিনযাপনের দায়ভারে দারুণভাবে অবনত গংগার পরিবার, কুড়নীর পরিবার। কুড়ুনী-গংগার দশ ও চোদ্দ ছাড়ানো উর্বর সময় বিক্রীত হয়েছে দারিদ্র্যের কাছে। খিদে অবরোধ করেছে প্রান্তবাসী ভিখিরি জীবনের বিকাশ। গংগার মানসিক জগৎ অধিকার করে নেয় লড়াই করে বেঁচে থাকার তত্ত্ব। গংগার দৃষ্টিপাত আষ্টেপৃষ্ঠে থাকে হাসপাতালের খাবার-ঘরের সামনে পোড়া কয়লার ছাই-ঢিপিটার কাছে। কখন শুকনো বেগুন, মুলো, পচা পচা দু'চারটে কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনায় সচেতন থাকে গংগা। কারণ সপ্তাহ শেষে রিলিফবাবু ওখানেই পচা-ভ্যাবসা মালগুলো ফেলে দিয়ে যায়। তখনই শুরু হয়ে যায় বেঁচে থাকার অধিকার, সংগ্রামের ইতিহাস। গংগার শৈশব এভাবেই শিখেছে অস্তিত্ব রক্ষার আদব। ফলে কারো ক্ষমতা নেই গংগার কাছ থেকে একমুঠো খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার। গংগার ভদ্রতাবোধ সম্ভ্রম হারিয়ে তখন নগ্ন। গালিগালাচে দশদিক আঁধার করে গংগা এভাবেই প্রতিনিধিত্ব করেছে প্রান্তবাসী জীবনের।

গংগা ও কুড়ুনীর মনের আবেগ, সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকবোধ বাস্তব জীবনের অন্ধকারকে অতিক্রম করে কল্পনার কুহকীজাল নির্মাণ করতে চাইলে সেটি প্রতিহত হয়েছে মানবেতর জীবন-যাপনের প্রাত্যহিকতায়। স্বপ্নবিন্যাসে আপ্লুত গংগা।অথচ, এই গংগা-কুড়ুনীর দৈনন্দিন যাপিত পৃথিবীর কদর্য মাটিতে। দুপুরবেলায় না

খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতায় বড়ো হয়েছে গংগা। পোয়াটাক চাল মা-বেটিতে ভাগাভাগি করে খেয়েছে তারা। সঙ্গে পাড়ার কানাই মোড়লের বেড়ার ধারে পড়ে থাকা হাড় লিকলিকে মরাটে কুমড়োলতি ভাজা। হরসময় পড়ে পড়ে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বস্ত্রটুকুই একমাত্র সম্বল কুড়ুনীর কা ছে। মালবাবুর অশালীন আচরণকে প্রশ্রয় দিয়েই গংগা আদায় করেছে মাত্র দু'হাতা তেল থলথলে খিচুড়ি। বাপের অক্ষমতায় কুড়ুনী দেখেছে সংসারের দুর্দান্ত অক্ষমতা। গংগার বাপের পরিচয় চোর। গংগাকে সমবয়সী পরিমণ্ডলে ডাকা হয়- চোরের বিটি। ফলে মনঃকষ্টে, ঘৃণায় গংগা কাটাতে থাকে অস্বাস্থ্যকর জীবন।

'বগুলাহুট' গল্পটি এভাবে সমাজের নিচুতলার, প্রান্তজনের নিঘৃণ্য জীবনের চলচ্চিত্রই হয়ে ওঠেনি, ধরা পড়েছে ঐ সমাজের সদ্যপ্রাপ্ত যৌবনের নিহত প্রতিধ্বনি, বেঁচে থাকার ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস।

পেটের দায়ে নিচু হয়ে থাকা, সভ্যতার চলমান কক্ষের এককোণে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে থাকা মানুষগুলোর মানবেতর জীবন প্রণালী দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে। বশীভূত করতে না পারা পেটের দায়ে বাপ-ঠাকুরদার শেখানো নৈতিকতার বোধকে বিসর্জন দিয়ে চুরির পথ বেছে নিয়েছে 'চাতক' গল্পের বুড়ো। একসময় গ্রামের মুরুব্বি হয়ে চুরির অপরাধে নিতাইকে বিচার করেছিল যে বুড়ো, সে-ই মাত্র দু'একটি ডাবের জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে অবস্থাবিশেষে। রক্ত পায়খানা-বমিতে কাবু শরীরের সামর্থ্য অর্জনে ডাক্তারবাবুসহ পারিপার্শ্বিকজন পরামর্শ দিয়েছে ডাব পানের জন্য। ফলে হাসপাতালের কড়া কড়া ওষুধ, ইনজেকশনে ঘায়েল বুড়ো অসহায় আর্তের মতো নির্বাচন করে নিয়েছে অসৎ পন্থা। পরিস্থিতির তীব্র প্রতিকূলতা এভাবে প্রান্তজনকে বাধ্য করেছে নৈতিক স্থানচ্যুতিতে।

ডাব খাওয়ার তীব্র লালসা ও অনিবার্যতা নিয়ে বুড়োর মধ্যে যে চরম মানসিক দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়, ফলস্বরূপ প্রান্তবর্গীয় সমাজে বার্ধক্যের চূড়ান্ত দৈন্যদশা প্রকট হয়ে উঠেছে গল্পে। গাঁ-ঘরে একষট্টি বছর অতিবাহিত করেছে সে। অথচ একটা ডাবের অধিকারও জন্মায়নি তার। যে ডাব-নারকেল পেড়ে একসময় বাবুদের কাছে বাহবা কুড়িয়েছিল সে, সেই একটা ডাবের অপ্রাপ্তিতে তার বেঁচে থাকার উদ্যম, জীবনীশক্তিই শুধুমাত্র নিঃশেষিত হয়নি, পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাসবোধ, ভালোলাগাটাই ফিকে হতে থাকে। টিউবওয়েলের পাশে পড়ে থাকা কাটা ডাব, কলের জলের স্পর্শে তার অতিরিক্ত সজীবতা, শিশিরসিক্ত হয়ে ডাবের তরতাজা সৌন্দর্য প্রকাশ- এভাবে সময়ের পালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে কাটা ডাবের রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে বুড়ো। ফলে অপ্রাপ্তির আর্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে বিক্ষুব্ধ হয়েছে তার বেঁচে থাকার প্রবণতা।

বার্ধক্য বিনষ্ট করেছে সম্পর্কের বুনিয়াদকে। প্রান্তবর্গীয় সমাজে সম্পর্কের সুতো শিথিল হয়েছে বার্ধক্যে, অভাবে, স্বার্থসুরক্ষায়। সন্তানের সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রায়শই বিচ্ছেদ ঘোষিত হয়েছে এই সমাজের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে। ভিন্ন হয়ে যাওয়া ছেলের প্রতি বাপের প্রতিক্রিয়া,

"ছেলের নিন্দে শুনতে কার ভালো লাগে? ছ্যাকা তো নিজের গায়েই লাগে। এ যেন উপর দিকে থুতু ছুঁড়ে দেওয়া। বাপ-ছেলের সম্পর্কটা এখন পোড়া বিড়ির চেয়েও খারাপ।"[৯]

গল্পে বাপের অসুস্থতায় কর্ণপাত করেনি বেচা। হাসপাতালে দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির গাছের দুটো ডাবও সে বরদাস্ত করেনি বাপের জন্য। প্রান্তবর্গীয় সমাজে বাপ-মায়ের প্রতি সন্তানের সম্পর্কের এই অবক্ষয় আরও প্রান্তিক করেছে বার্ধক্যকে। ফলে বার্ধক্যে পরাজিত প্রান্তজন দৈনন্দিন পদানত

হয়েছে সম্পর্কের কাছে, নিত্য অভাব-অভিযোগে। গল্পে প্রকাশ পেয়েছে বুড়োর অসহায় মানসিক পরিস্থিতি,

> "পিচবোর্ডের চেয়েও শক্ত পেটটা বড় অবাধ্য তার। বেহিসেবী। খালি যখন তখন খিদে পাইয়ে দেয়।"[১০]

গল্পে আশ্চর্য শিল্পময়তার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে খিদের বাস্তব স্বরূপ। হাসপাতালের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে বৃদ্ধের যে ছবি দেওয়ালে ফুটে উঠেছে, সেখানে পাওয়া যায় গর্তে ঢোকা পেটের ছবি। বৃদ্ধের নিজস্ব আইডেন্টিটির পরিবর্তে ক্ষুদার্ত পেটের দাবিটিই সর্বগ্রাসী পরিণতিতে প্রকাশ্যমান হয়ে উঠেছে। পেটের দাবিতেই বিষ্ণুপদবাবুর বাড়ির পেট ফুলে মারা যাওয়া ছাগলটিকে ভাগাড়ে বিসর্জন দিতে পারেনি বৃদ্ধ। ঠ্যাং উল্টানো ছেরানো ধাড়ীটাকে বাড়িতে এনে যত্ন সহকারে কেটে রান্না করে একাই খেয়েছে দু'সের মাংস, থলথলে চর্বি, মেটে। দীর্ঘদিন মাছ-মাংসের অনটনে ভোজবাড়ির মতো রসিয়ে রসিয়ে রেঁধে খেয়েছে রোগগ্রস্ত ছাগলটিকে। জীবনের সুরক্ষার পরিবর্তেও জীবনের স্বাদ বেশি মহার্ঘ্য হিসেবে পরিচালিত করেছে প্রান্তজনকে, ফলস্বরূপ গল্পে দেখা যায় বৃদ্ধের শোচনীয় অবস্থা। হাসপাতালে কাঁচকলা সহযোগে শিঙি মাছের ঝোল ও ভাত দেওয়া হলে বুড়োর প্রতি বুড়ির সাবধানবাণী -একটু সামলে-সুমলে খাওয়ার জন্যে। অভাবী জীবনে খাওয়ার প্রবল প্রত্যাশায় যে চূড়ান্ত পরিণতি ঘটতে পারে, তার ফলস্বরূপ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে 'চাতক' গল্পটি। খাওয়ার প্রতি প্রান্তজনের প্রত্যাশাটাই নামকরণেও শৈল্পিক দাবি অধিকার করেছে গল্পে।

'গোবরাহনু' গল্পটি জীবিকার বিশেষত্ব ও মানবিকতার পরিচয়ে উদ্দীপ্ত একটি অসাধারণ গল্প। প্রান্তজনের জীবনচর্চায় মনোনিবেশ করলে একটি সাধারণ চিত্র প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় - অনেকক্ষেত্রেই কর্মে পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা, প্রবল দারিদ্র্যেও সংসারে তাদের উদাসীনতা, সংসারে মেয়েদের হাল ধরা, বাইরে কাজে যাওয়া, সঙ্গদোষে পুরুষের নেশাভাঙ গ্রহণ এবং পারিবারিক কলহ। অনিল ঘড়াইয়ের একাধিক গল্প সহযোগে 'গোবরাহনু' গল্পের প্রথমাংশেও এই চিত্রটিই ধরা পড়েছে। ক্রমে গল্পের উত্তরণ স্তরে এসে দেখা যায় চিত্রবদল। ময়নার শাসন-পীড়নে গোবর কাজে অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় চরিত্রের নাম পরিচয়। প্রান্তিক সমাজে এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নামের চরিত্ররা নির্ধারণ করে দেয় তাদের অতি নগণ্য জীবনধারণের চালচিত্রকে। গোবর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের অগ্নিময় জ্বালা-হতাশা পেরিয়ে ময়নার প্রেরণায় গাছ ঝোড়ার কাজে লেগে পড়ে। গাছে চড়ার দক্ষতা দেখে একসময় লোকে তাকে ঠাট্টা করে 'লেজছাড়া হনু' নামে আখ্যায়িত করেছিল, সেই উপাধিভূষণকে কাজে লাগিয়েই গাছ ঝোড়ার কাজে মনোনিবেশ করছে সে।

> "লোকের কথা শুনে উৎসাহের ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠত বুকের ভেতর। গাছে চড়ে সে কসরৎ দেখাত বাঁদরের মতো, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে লাফ দিত এক ডাল থেকে আর এক ডালে। তার রোগা-প্যাটকা শরীরটা সরু ডালে দিব্যি মানিয়ে যেত, কখনো ডাল ভেঙে নীচে পড়ত না ধুপ করে। নীচে দাঁড়িয়ে যারা দেখত ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যেত তাদের"।[১১]

গাছে চড়ার দক্ষতা দেখেই একসময় প্রেম নিবিড় হয় ময়না ও গোবরের মধ্যে। গাছে চড়ার কাজে বিপজ্জনক ঝুঁকি থাকলেও তাকে তোয়াক্কা না করেই সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে গোবর। প্রান্তিক জনজীবনে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যে জীবিকার উপরেই তারা নির্ভরশীল হোক না কেন, সেটি যতই

সাধারণ হোক, কাজের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা-সততা। গাছ ঝোড়ার কাজে গোবর সামাজিক সম্মান বা স্বীকৃতি পায়নি বটে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তার আত্মমগ্নতা, আনন্দলাভ অনন্য স্থান অধিকার করেছে। গোবরের অনুভূতিতে,

> "যখন ওপর পানে চড়ছি তখন নজর আমার ওপর পানেই থাকে। যার একবার ওপর পানে নজর যায়- সে কোনোদিন নীচে তাকায় না। ওপরে ওঠার নেশাটাই আলাদা। এ আমি তোমাদের ঠিক বোঝাতে পারব না। সুপরিগাছের শির ছুঁলে ওই আকাশ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে গো। তার ডাক আমি শুনি। আমার তখন নেশাখোর মানুষগুলোর মতো অবস্থা। কিছুতেই নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। উঁচা উঁচা গাছগুলোও যে আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলেই ভাবে"।[১২]

গাছ ঝোড়ার কাজে গোবরের এই অনির্বচনীয় আনন্দের পাশাপাশি তার এবং ময়নার মানবিক বোধের সজীবতা অনন্য মাত্রা দিয়েছে তাদের চরিত্রধর্মে। মেয়ের অসুস্থতার দিনে কুণ্ডুমশাইয়ের কাছে দুটো ডাব চেয়ে সাহায্য পায়নি গোবর, উপরন্তু অপদস্থ হয়েছে। আবার গাছ ঝোড়ার দিনে সন্দেহ প্রবণতায় কুণ্ডুমশাই নজরদারি চালিয়েছে গোবরের উপর। অথচ কুণ্ডুমশাইয়ের অসুস্থতার দিনে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কুণ্ডুমশাইয়ের ছেলে এসে পৌঁছায় গোবরের কাছে। রাতবিরেতে ডাব পেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে প্রতিশোধস্পৃহা পূরণ করতে চাইলেও পরমুহূর্তেই ময়নার প্রেরণায় মানবিক বোধ ফিরে পায় গোবর। গভীর অন্ধকারেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করে সে। গল্পের শেষে বলা হয়েছে,

> "অন্ধকার পথে নেমে এসে গোবরের মনে হয় মানুষের জীবনে কোনো কিছুই বুঝি বৃথা যাবার নয়। যে কাজকে প্রথমে সে ঘৃণা করত, এখন সেই কাজকেই সে ভালোবাসতে শিখেছে। তাই এই হিম আঁধারে পথ চলতে তার কোনো ভয় করে না"।[১৩]

উচ্চসমাজের উপেক্ষা, বিদ্রুপ, জীবনের হতাশা, হীনম্মন্যতা, অভাব পেরিয়ে প্রান্তজনের এই অসাধারণ মানবিক ভূমিকা, কাজের বৈচিত্র্য, একাগ্রতা প্রান্তজনকে চিহ্নিত করেছে স্বতন্ত্র হিসেবে। উপরোক্ত গল্পগুলি ছাড়াও অনিল ঘড়াইয়ের আরও একাধিক গল্প যেমন- 'কাকমারা', 'ভোটবুড়া', 'হাত', 'জার্মানের মা', 'পুনশ্চ পরশুরাম', 'পিণ্ডি', 'চৌকিদার', 'হাতিছাপ', 'খরার আকাশ', 'ইলিশ', 'ছবি', 'বন্যার নদী', 'ভুমিপুত্র', 'ঘাসমুখ' ইত্যাদি ছোটোগল্প প্রান্তজনের জীবন-জীবিকা উন্মোচনে অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

১। ঘড়াই, অনিল, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ৬৬।
২। ঘড়াই, অনিল, 'পরীযান ও অন্যান্য গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ২৮৩।
৩। ঘড়াই, অনিল, 'অন্ত্যজ প্রেমের গল্প', কলকাতা, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ২৬।
৪। ঐ, পৃ. ২৭।
৫। ঐ, পৃ. ৩০।
৬। ঐ, পৃ. ২৮।
৭। সরকার, প্রভাতচন্দ্র (সম্পা), এবং আলোচনা, (বাংলা উপন্যাসে জীবন ও জীবিকা), প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর, ২০২২, পৃ. ৭৭।
৮। ঘড়াই, অনিল, 'অন্ত্যজ প্রেমের গল্প', কলকাতা, আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ২২৪।
৯। ঘড়াই, অনিল, 'পরীযান ও অন্যান্য গল্প, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০, পৃ. ৫৮।
১০। ঐ, পৃ. ৬৭।
১১। ঘড়াই, অনিল, অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্প, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫, পৃ. ২৭।
১২। ঐ, পৃ. ২৯।
১৩। ঐ, পৃ. ৩৬।